*// গণতন্ত্রের রথচক্রে বিদীর্ণ অধুনা বঙ্গভূমি //**

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়
পরিবেশ ও সমাজকর্মী

ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি বেঁচে থাকার অধিকার ও দ্বিতীয়টি মত প্রকাশের অধিকার। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের মধ্যরাতে ভারতকে দ্বিখন্ডিত করে স্বাধীনতা ঘোষিত হল এবং ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সব থেকে বেশি আন্দোলন করেছিলেন সেই দুটি রাজ্য যথাক্রমে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবকে দ্বিখন্ডিত করে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করা হল। দ্বিখন্ডিত বঙ্গভূমির পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হল এবং পশ্চিমবাংলা যুক্ত হল ভারতের সঙ্গে। পূর্ব বাংলা অধুনা বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত এবং ১৯৭১ সালে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন রাষ্ট্রে পরিণত হল। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে পরিগণিত হল এবং ভারতীয় সংবিধানের রীতিনীতি অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫২ সাল থেকে বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সাম্প্রতিক কালে আমরা সপ্তদশ নির্বাচন শেষ করে নতুন মন্ত্রীসভা পেলাম। ১৯৫২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে মোট ভোটারের মধ্যে কেবলমাত্র ৪৩% মানুষ ভোটদান করেছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে ভোটদানের নথি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১৯৭৭ পর্যন্ত মোটামুটি ৫৬% মানুষ ভোট দিতেন। কিন্তু ১৯৮২ সাল থেকে ক্রমাগত ভোটের রাজনীতিতে মানুষের অংশগ্রহণ বর্ধিত হতে থাকে। বর্তমান পরিসরে, বিশেষ করে ২০০৬, ২০১১, ২০১৬ এবং ২০২১ সালে প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ভোটে অংশগ্রহণ করেছেন। ভোটে অংশগ্রহণকারী মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি নিশ্চয় করে নাগরিক সচেতনতার আত্মপ্রকাশ। কিন্তু এই নাগরিক সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছে যার নাম "নিরবিচ্ছিন্ন হিংসা - প্রতিহিংসার প্রবাহমানতা"।

১৯৫২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সরকারি কর্মী হিসাবে অংশগ্রহণকারী একজন পুলিশ আধিকারিক তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন সেই সময় পুলিশ বা সরকারি কর্মীদের ভোটের সময় হিংসাত্মক কার্যকলাপের ব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত থাকতে হত না। স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই ভোটদান হত কিন্তু পঞ্চাশের দশকে যাঁরা ভোট দিতে আসতেন, বিশেষ করে গরীব মানুষ, তাঁরা ভোটদান বিষয়টি প্রায় বুঝতেনই না এবং অনেকেই ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভাবতেন বোধহয় কিছু পাওয়া যাবে!

১৯৫২ সালে স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভা নির্বাচনে মূলতঃ দুটি দল অংশগ্রহণ করেছিল। একটি স্বভাবতই কংগ্রেস এবং অন্যটি বামপন্থী দল। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই নির্বাচন ঘিরে মানুষের মনে উৎসাহ, ঔৎসুক্য ছিল বেশি। সমস্ত মানুষ, ধনী থেকে দরিদ্র, সবাই এই ব্যাপারটিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং তখন বিধানসভায় ২৩৮ টি কেন্দ্রের মধ্যে কংগ্রেস ১৫০ টি আসন জয়লাভ করে এবং কমিউনিষ্ট পার্টি জয়লাভ করে ২৮টি আসনে এবং মোট প্রদত্ত ভোটের ১১.৮% ভোট পায়। সেইসময় ফরোয়ার্ড ব্লকও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং তারা ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে ১৯৬৭ পর্যন্ত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসেরই আধিক্য ছিল। বামপন্থীরা ১৯৫০, ৬০ এবং ৭০ এর দশকেও মূলতঃ শাসকবিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত করতেন। এইসময়, মনে রাখা দরকার, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষদের বেঁচে থাকার অধিকারকে সামনে নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেন বামপন্থীরাই এবং তার ফলে পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনগুলির ক্ষেত্রে ছিন্নমূল মানুষদের যে সমস্ত জায়গায় আধিপত্য ছিল সেখানে বামপন্থীরা জয়যুক্ত হন। ১৯৫০ এর দশকের দুটি আন্দোলনের কথা এই আলোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। একটি গ্রামভিত্তিক এবং একটি শহরভিত্তিক। গ্রামভিত্তিক যে আন্দোলনটি বামপন্থীরা সংগঠিত করেছিলেন সেটি "তেভাগা আন্দোলন" হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তেভাগা আন্দোলনের মূল বিষয়বস্তু ছিল কৃষকরা জমি চাষ করলে যে ফসল ফলবে তার একটি অংশ কৃষকরা পাবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও গ্রামীণ অর্থনীতিতে জমিদার বা ভূস্বামীদের ভয়ংকর আধিপত্য ছিল। এই আধিপত্যের বিরুদ্ধে মূলতঃ তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনে গ্রামের কৃষক ও আদিবাসীরা যুক্ত হয়েছিলেন। জমিদার নিয়োজিত লাঠিয়াল বা মাস্তানবাহিনী এই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। তার ফলে তদানীন্তন রাষ্ট্রশক্তি বা শাসকদল তেভাগা আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালান এবং পুলিশের গুলিতে বহু কৃষক

রমণী মারা যান। উত্তাল হয়ে ওঠে গ্রামের আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের মুখ্যভাগে থাকে তদানীন্তন বিরোধীদল অর্থাৎ বামপন্থী দলগুলি। তেভাগা আন্দোলনের ক্রমান্বয় বিস্তার ছড়িয়ে পড়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এবং বামপন্থীরা গ্রামে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারে সমর্থ হয়। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় যে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হচ্ছিল সেই ব্যাপারে তদানীন্তন কংগ্রেস দল সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না, ফলে গ্রামের জমিদার ও ভূস্বামীরা কংগ্রেসের মুখপাত্র হয়ে পড়েন এবং গ্রামের নিরন্ন ভূমিহীন কৃষকশ্রেণী বামপন্থীদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। বিধানসভা নির্বাচনের সময় জমিদার এবং ভূস্বামীরা তাদের লাঠিয়ালদের দিয়ে ভোট করানোর চেষ্টা করতেন কিন্তু গ্রামীণ অর্থনৈতিক সংকট ও খাদ্যাভাব এই সমস্ত ভূস্বামীদের সৃষ্ট সব বাধা অতিক্রম করে জাগ্রত কৃষক আন্দোলন বাংলার মাটিতে এক নতুন ইতিহাস তৈরির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তার ফলশ্রুতি পরবর্তী ক্ষেত্রে যুক্তফ্রন্ট বা বামফ্রন্ট তৈরির ভিত্তি স্থাপন করে।

শহরের বুকে ছিন্নমূল মানুষদের নিয়ে যে আন্দোলন বামপন্থী দলগুলি করতে আরম্ভ করেন সেই আন্দোলনই ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৫০ এর দশকে এক পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয়। সেই আন্দোলন কলকাতার বুকে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ গুলি চালায় এবং বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী মারা যান। তদানীন্তন সময়কার রাজনৈতিক আন্দোলনের চেহারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ছিন্নমূল মানুষের আন্দোলন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, শিক্ষকদের আন্দোলন, শিক্ষার দাবিতে ছাত্র আন্দোলন সহ বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনই পরিচালিত হচ্ছিল বামপন্থীদের দ্বারা। চরম শাসকবিরোধী আন্দোলন চলা সত্ত্বেও বিরোধী দলনেতা বা বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের সমাজের বুকে একটি সম্মানের আসন ছিল যা কালক্রমে রাজনৈতিক সমর্থনে পরিণত হয়।

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে একেবারে কোনরকম অস্ত্রের আস্ফালন ছিল না বললে ভুল হবে। বিভাজিত সমাজব্যবস্থায় বিত্তশালী শ্রেণী তাদের প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক আধিপত্য কায়েম রাখতে স্বভাবতই শাসকশ্রেণী অর্থাৎ তদানীন্তন কংগ্রেস পার্টির খুব কাছের মানুষ হিসেবে নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। এমনকি বহু জমিদার বাড়ির ছেলে ও শহরের ধনী ব্যক্তিরা কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে বিধানসভা নির্বাচনে অংশগ্রহণও করেন। ফলতঃ সমাজের নিরন্ন প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষরা নিজেদের বেঁচে থাকার তাগিদে বামপন্থীদের শরণাপন্ন হন। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাস করেন এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকেই তাঁরা সংসদীয় রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে থাকেন। সংসদীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করলেও শ্রেণী সংগ্রামের নীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে বিত্তশালী শ্রেণীর ভাড়াটিয়া বাহিনীর সঙ্গে নিরন্ন শ্রেণীর সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য ছিল। ফলে গ্রামের নির্বাচনে এবং শহরের নির্বাচনে পারস্পরিক শক্তির আস্ফালন তদানীন্তন নির্বাচনী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। ১৯৬০ এর দশকের প্রথমদিকে বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রয়াত হন এবং প্রফুল্লচন্দ্র সেন মুখ্যমন্ত্রী হন। মাননীয় বিধানচন্দ্র রায় তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতার জন্য পশ্চিমবঙ্গের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিলেন এবং পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট ছিলেন। সেই সময় অসংখ্য জবরদস্তি কলোনী পশ্চিমবাংলায় গড়ে ওঠে এবং সেই কলোনীগুলিকে বিধানচন্দ্র রায় কখনই প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে বন্ধ করে দেননি। বামপন্থীরাও এই জবরদস্তি কলোনী স্থাপনকে সমর্থন করেছিলেন এবং এই সমস্ত কলোনী পরবর্তী ক্ষেত্রে বাম আন্দোলনের বীজভূমি হয়ে ওঠে। বিধান রায়ের মৃত্যুর পর প্রফুল্লচন্দ্র সেনের সময়ে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেয় এবং মনে রাখা প্রয়োজন তার আগে খাদ্য আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলিচালনার ফলে কমপক্ষে ৮০ জন মারা যান। এই প্রফুল্ল সেনের সময়েই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে ওঠে এবং খাদ্যশস্য নিয়ে যাওয়ার সময় তা লুঠ করার চেষ্টা করেন নিরন্ন মানুষ। পুলিশের গুলিচালনার ফলে প্রাণ হারায় আনন্দ হাইত এবং নুরুল ইসলামের মত কিশোররাও। গোটা রাজ্য জুড়ে খাদ্য আন্দোলন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে এবং অনিবার্যভাবেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন উন্মত্ত ক্ষুধার্ত জনতা। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটে এবং প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষরা মনে করেন তাঁদের সমর্থিত সরকার ক্ষমতায় এসেছেন এবং আগে যাঁরা অত্যাচারিত হয়েছেন তাঁরা তখন সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠেন যার ফলশ্রুতিতে ঘটে যায় বেশকিছু হিংসাত্মক ঘটনা। কারখানার শ্রমিকরাও এই সময়ে মালিকের বিরুদ্ধে এক নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করেন যার নাম "ঘেরাও"। দীর্ঘ সময় ধরে জমে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত সমাজের বুকে

আছড়ে পড়ে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করেন যে শ্রমিকরা আন্দোলন করলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করবে না। এর ফলে মালিকরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের ভাড়া করা গুন্ডাবাহিনী অদৃশ্য হয়ে যায়। গ্রামাঞ্চলেও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়। জোতদার এবং জমিদারদের লাঠিয়ালরা কৃষকদের সংগ্রামী মেজাজের সামনে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক পালা বদল নির্বাচনের আগে বা পরে বা নির্বাচনের সময় একেবারেই অহিংস ছিল না অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়া হয় বা অন্যভাবে বলতে গেলে যারা যুক্তফ্রন্ট তৈরি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনৈক্য দেখা দেয়। পুনরায় নির্বাচন হয় এবং আরও বিপুল ভোটে জয়লাভ করে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়।

১৯৬৭ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বুকে জন্মগ্রহণ করে অতিবাম একটি রাজনৈতিক দল যাঁরা মনে করতেন সংসদীয় রাজনীতির মধ্য দিয়ে গরীব মানুষের কোন মৌলিক দাবি বা চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় এবং সেই কারণে ভোটমুখী মানুষকে ক্রমান্বয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে নিয়ে যেতে হবে। লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা নেই, এবং তাই স্কুল কলেজে অগ্নিসংযোগ, মাস্টারমশাইদের হত্যা করা, পুলিশকর্মীকে খতম করা সহ সংসদীয় রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদেরও হত্যা তখন পশ্চিমবঙ্গের দৈনন্দিন খবরে পরিণত হল। উত্তরবঙ্গ ও অবিভক্ত মেদিনীপুর সহ কয়েকটি স্থানে কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হল। এই আন্দোলনকে অনেকেই নকশালবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করেন। ১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দেওয়ার পর যে নির্বাচন হয় তাতে সংসদীয় রাজনীতির বিরোধীতা করে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসের বাতাবরণ প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু ১৯৭০ সালে কোন রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান না ফলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রশাসক নিযুক্ত করা হয় এবং কেন্দ্র নিযুক্ত প্রশাসকের মাধ্যমে অতিবাম সহ সকল বামপন্থী আন্দোলনকেই দমন করতে ব্যাপক পুলিশি সন্ত্রাস আরম্ভ হয় যাকে শ্বেতসন্ত্রাস বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯৭০ থেকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক আতঙ্কের রাজত্ব কায়েম করা হয় এবং ১৯৭২ সালের বহুচর্চিত ও বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস দল ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে এবং বামপন্থীরা জয়ী হন মাত্র কয়েকটি আসনে। ১৯৭২ সালের নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বামপন্থীরা বিধানসভা বয়কট করেন যদিও এই সময় কয়েকটি বামপন্থী দল কংগ্রেসের সঙ্গে জোটবদ্ধ ছিল। অতিবাম যে শক্তির উত্থান ঘটেছিল তা প্রায় স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯৭৬ সালে কেন্দ্রীয় সরকার জরুরি অবস্থা জারি করেন অবশ্য তার আগেই ১৯৭৪ সাল থেকে শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কেন্দ্রের অনৈতিক সরকারের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন বাতিলের আদেশ সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক নতুন আবহাওয়া তৈরি করে এবং সেই আন্দোলনের ঢেউকে নিয়ন্ত্রণ করতে কেন্দ্রীয় সরকার আভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন যা ভারতবর্ষের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক চরম অন্ধকার ও কলঙ্কজনক অধ্যায়। দেশের অন্যতম মৌলিক অধিকার বাক স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। অভূতপূর্ব এই পরিস্থিতির মধ্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে জনতা দল গড়ে ওঠে এবং কংগ্রেসেরও বহু নেতা এই জনতা দলে সামিল হন।

১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। তার কয়েকমাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত এবং এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সামনে প্রধান কাজটি ছিল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, মিথ্যা মামলায় বন্দী রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি দেওয়া, রাজ্যের সার্বিক শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও শিক্ষাজগতে যে ভয়ংকর নৈরাজ্য তৈরি হয়েছিল তার অবসান ঘটানো। জ্যোতি বসু ও তাঁর মন্ত্রীসভা শপথ নেওয়ার পরেই প্রায় ১৬০০০ রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে যে ফৌজদারি মামলা ছিল সেগুলি প্রত্যাহার করা হয়। বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হয়। রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কারণে যাঁরা এলাকা ছাড়া হয়েছিলেন তাঁদের ঘরে ফেরানো হয়। বামফ্রন্টের এই বিপুল জয় প্রান্তিক মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে এক ব্যাপক আশা সঞ্চার করে এবং তাকেই ভিত্তি করে বামফ্রন্ট সরকার প্রশাসনিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ আরম্ভ করেন। গণতন্ত্রের বিকাশ কেবলমাত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা নয়, তা হল সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ। এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে বামফ্রন্ট প্রত্যেকটি পৌর এলাকায় নির্বাচনের আয়োজন করে এবং নির্বাচিত সদস্যদের হাতে স্থানীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র পৌর এলাকাতেই কার্যকরী ছিল না, স্বাধীনতার পর দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গেই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কায়েম করা হয় যার মধ্য দিয়ে গ্রামে তৃণমূল স্তরে গণতন্ত্রের ধারণা প্রসারিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের এই

প্রসারিত গণতন্ত্রের মাধ্যমে এক জনগণতান্ত্রিক জগৎ তৈরি হল যে জনগণতান্ত্রিক জগতে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ৬৪০০০ ছুঁয়ে গেল। অতীতে লোকসভা, বিধানসভা ও পৌরসভা মিলিয়ে এই সংখ্যাটা ৩০০০ এর বেশি ছিল না। কিন্তু ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রসারিত গণতন্ত্র মানুষের হাতে এই ব্যাপক ক্ষমতা অর্পন করল এবং সূচনা হল এক নতুন যুগের।

পৌর নির্বাচন ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে প্রসারিত করার যে উদ্যোগ বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছিলেন সেই কথা আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবে মহাত্মা গান্ধীর কথা উঠে আসে। মহাত্মা গান্ধীর লেখনী এবং বক্তৃতায় পঞ্চায়েত রাজ ও সমবায় আন্দোলনের বিষয় বারংবার চর্চিত হয়েছে। কংগ্রেস দলের অন্যতম দার্শনিক মহাত্মা গান্ধী যে পঞ্চায়েত রাজ-এর কথা ভেবেছিলেন তাকে কংগ্রেসীরা কায়েম না করলেও, বামপন্থীরা প্রান্তিক মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবার জন্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন এবং একইভাবে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির হাতেও, আইন মেনে এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করে, প্রশাসনিক ক্ষমতা তুলে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে গ্রামে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আড়ালে আবডালে ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা জমিদারতন্ত্রে ব্যাপক আঘাত নেমে এসেছিল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গ্রামে এবং শহরে ব্যক্তিগত বা পরিবারভিত্তিক জমির উর্ধসীমা বেঁধে দিয়েছিলেন এবং এই আইনগুলি কাজে লাগিয়ে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামীণ অর্থনীতির এক আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামের অর্থনীতিতে এক অভিনব রূপান্তর এল যার মধ্য দিয়ে ভূস্বামীদের উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকরা পেয়ে গেলেন এবং কৃষিক্ষেত্রে এল এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন যার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য সহ কৃষি উৎপাদনে দেশের সেরা রাজ্যে পরিণত হল। এই সব পরিবর্তনই সম্ভব হয়েছিল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের ফলে, যাকে বলা যেতেই পারে দরিদ্রের স্বার্থে গণতন্ত্রের সুচারু সম্প্রসারণ।

ভারতীয় সংবিধানে কালক্রমে এই স্থানীয় প্রশাসন সাংবিধানিক স্বীকৃতি পেল এবং তৃতীয় সরকার নামে অভিহিত হল। বামফ্রন্টের সময়ে গণতন্ত্রের এই রথচক্র প্রায় মসৃণ ভাবে ১৯৯০ এর দশকের মধ্যবর্তী সময়কাল পর্যন্ত এগিয়ে চলল দুর্বার গতিতে। কিন্তু এই দুর্বার গতির মধ্যেই জন্ম নিচ্ছিল কয়েকটি মারাত্মক ভাইরাস যাকে বলা পারে "আধিপত্যবাদ" বা "কর্তৃত্ববাদ"। বামপন্থী দলগুলি এই পরিবর্তন সূচনা করার পরে তাঁরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিরোধীতা বা সমালোচনার জায়গা বন্ধ করে দিতে চাইলেন এবং স্কুল, কলেজ, সমবায় সর্বত্র নিজেদের পরিচিত মুখকে বসানোর চেষ্টা করতে থাকলেন যাকে বলা যেতে পারে এক দখলদারি রাজনীতি। অতীতে স্কুল, কলেজ বা সমবায় সংস্থায় এমনকি কারখানাতেও প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিশেষ ছিল না। কিন্তু কালক্রমে সবই রাজনীতির করায়ত্ত হতে আরম্ভ করল। পরস্পরকে মানুষ চিনতে আরম্ভ করল সে কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থক সেই হিসেবে। ফেলে আসা শতাব্দীর শেষ পর্বে যখন ক্রমান্বয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকে "আধিপত্যবাদ" জায়গা করে নিতে আরম্ভ করল ঠিক সেই সময়ে আরেকটি ঘুমন্ত ভাইরাস জেগে উঠল যাকে বলা যেতে পারে "ধর্মীয় আধিপত্যবাদ"। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মানুষ এতদিন পর্যন্ত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল যথাক্রমে বিত্তশালী শ্রেণী ও বঞ্চিত শ্রেণী। ক্রমান্বয়ে এই অর্থনৈতিক বিভাজনের জায়গায় জায়গা নিয়ে নিল রাজনীতির রঙ এবং তাকে অনুসরণ করে রাজনীতিতে ঢুকে গেল "ধর্মীয় আধিপত্যবাদ"। ভোটাররা চিহ্নিত হতে আরম্ভ হলেন ধর্মের ভিত্তিতে। বামপন্থীদের ধর্মনিরপেক্ষতার ভূমিকাও ক্রমশঃ খর্ব হতে থাকল এবং সর্বশেষে বামফ্রন্ট সরকারের চাপিয়ে দেওয়া শিল্পনীতি মানুষ অগ্রাহ্য করল। যে সমস্ত শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সরাসরি প্রশাসনের সমর্থন পেতেন সেই সমস্ত শিল্পপতিরা এক অদ্‌ভুত প্রক্রিয়ায় বামফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের কাছের মানুষ হয়ে উঠতে থাকলেন। ফলতঃ দুশ্চিন্তা বাড়ল শ্রমিকশ্রেণীর এবং তাঁরা অন্য কোন শিবিরের সন্ধান শুরু করলেন। যে বামফ্রন্ট সরকার একসময়ে কৃষকদের হাতে জমি তুলে দিয়েছিলেন সেই সরকারই কৃষকের জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রশাসনকে কাজে লাগালেন। বিরোধী দক্ষিণপন্থী শক্তি বা অতিবাম শক্তি এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মানুষের মুখপাত্র হতে আরম্ভ করলেন এবং আরেকটি পালা বদলের প্রক্রিয়ার সূচনা হল।

২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনে বামপন্থীরা পিছিয়ে পড়লেন এবং তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটাই এগিয়ে গেল অর্থাৎ ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে কি ঘটতে চলেছে তা প্রায় পরিষ্কার হয়ে গেল। ঝাড়গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলমহলে মাওবাদীরা অত্যন্ত

তৎপর হয়ে উঠল এবং বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করল আর এক বছরের মধ্যে কেবলমাত্র ঝাড়গ্রাম এলাকাতেই কয়েকশো আদিবাসী মানুষ খুন হয়ে গেলেন। মাওবাদীদের চোখে এই গরীব মানুষগুলিই ছিলেন তাদের রাজনৈতিক শত্রু। অতীতে জমিদখলের লড়াইকে কেন্দ্র করে জমিদারের সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু এবারে সংঘর্ষের চেহারা গেল বদলে। ক্ষমতা করায়ত্ত করতে অতিবামরা গরীব মানুষকেও খুন করতে দ্বিধা করল না, এমনকি চলন্ত ট্রেনে বোমা ফাটিয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুকে নিশ্চিত করতেও তারা কুন্ঠিত হল না। অতিবাম বা মাওবাদীরা, তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস সবাই একজোট হয়ে বামফ্রন্টের অবসান ঘটালো এবং ২০১১ থেকে রাজ্যের ক্ষমতায় আসীন হল তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর থেকে যতধরনের নির্বাচন হয়েছে হিংসা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে থাকে ব্যাপক প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা। শাসক দল কিংবা বিরোধী দল সবাই জেতার জন্য মরিয়া কেননা একবার জনপ্রতিনিধি হতে পারলে তা সে যে কোন স্তরেই হোক না কেন হাতে আসবে প্রভূত ক্ষমতা আর সেই ক্ষমতার বলে দুর্নীতিও হয়েছে ক্রমবর্ধমান। ক্রমান্বয়ে দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়েছে। এমনকি রাজ্যের সর্বোচ্চ স্তর থেকে বলতে হচ্ছে কেউ যদি টাকা চুরি করে থাকেন তা ফেরত দিন। একটার পর একটা অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারি কিন্তু কোন শাস্তি নেই। পার্লামেন্টের এথিক্স কমিটিও "নিদ্রা গিয়েছেন"। দুর্নীতি, আধিপত্যবাদ, সমাজের একদম সর্বস্তরে প্রসারিত হয়েছে যার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চায়েত ও পৌর প্রতিনিধিদের ব্যাপক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য বা করায়ত্ত করার জন্য নির্বাচনের সময় শুরু হল ব্যাপক সন্ত্রাস। অতীতে রাজনৈতিক লড়াই ছিল বিত্তবান শ্রেণীর সঙ্গে প্রান্তিক গরীব মানুষের লড়াই। সেই লড়াই রূপান্তরিত হল গরীব মানুষের মধ্যে ক্ষমতা করায়ত্ত করার লড়াইতে। নির্বাচনী সন্ত্রাসের বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে পঞ্চায়েত বা পৌর নির্বাচনের সময়েই সব থেকে বেশি সন্ত্রাস হয়েছে এবং এখনও হয়ে চলেছে। বহু পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন বিরোধী লোকই প্রার্থী হতে সাহস করেন নি কারণ নির্বাচন মানেই যেন মৃত্যুর মিছিল। বিশেষ করে ২০০১ - ০২ থেকে নির্বাচনী সন্ত্রাস ক্রমান্বয়ে পশ্চিমবঙ্গের বুকে এক অবধারিত সত্যে পরিণত হয়েছে যা ২০২১ পর্যন্ত অব্যাহত। গণতন্ত্রের রথচক্রে বিদীর্ণ হচ্ছে বঙ্গভূমি আর প্রান্তিক মানুষের রক্তে এমনকি শিশু-মৃত্যুর মত ঘৃণ্য ঘটনায় কলঙ্কিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। সুষ্ঠ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকরণের জায়গায় আজ জায়গা নিয়েছে আধিপত্যবাদ এবং ধর্মীয় আধিপত্যবাদ। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই এশিয়া মহাদেশের প্রথম রেনেসাঁ-র জন্ম, এশিয়ার প্রথম নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন এক বঙ্গসন্তান এবং এশিয়ার প্রথম মহিলা ডাক্তারও একজন বঙ্গকন্যা। এই সমস্ত গৌরবগাথাই আজ বঙ্গের ইতিহাসে কেবলমাত্র ধূসর মলিন স্মৃতি। রাজনীতির কঠোর অনুশাসনে বঙ্গবাসী আজ সন্ত্রস্ত। তবু ভাবতে ভালো লাগে এবং দেখতে ভালো লাগে এই ঝড়ের রাতে, মহামারীর সময়ে নবীন প্রজন্মের কিছু মানুষ নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মানবিক আচরণ করে চলেছেন। এঁরাই হয়তো আগামী দিনে প্রকৃত গণতন্ত্রের দিশারী হয়ে উঠবেন।